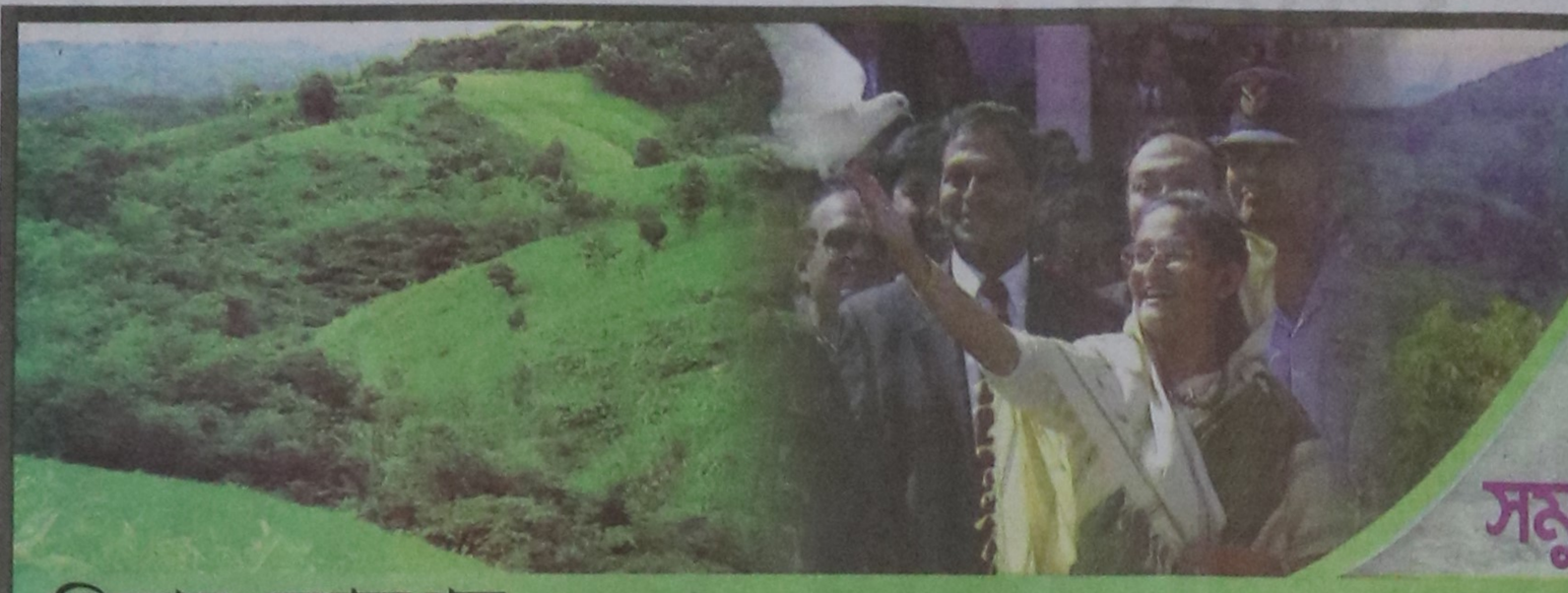

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির এক যুগ পূর্তি

সমুখে এগিয়ে চলার নতুন দিন

বিশেষ ক্রোড়পত্র

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের এক যুগ পূর্তি উৎসব পালিত হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি।

বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং রাঙ্গামাটি নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অপার আধার। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছেন। তাদের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অঞ্চলগুলোকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। পার্বত্য জেলাগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতা ও উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। আমি বিশ্বাস করি শান্তি চুক্তির মাধ্যমেই পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির উন্নয়নে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহবান জানাই।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো: জিল্লুর রহমান

ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির এক যুগ পূর্তি

আজ ২ ডিসেম্বর। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৯৭ সালের আজকের এই দিনে সবুজ পাহাড় আর হলুদ ফুলের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘ দুই যুগের বিরাজমান সশস্ত্র সংগ্রাম, সংঘাত ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসানের সূচনা হয়। এখন পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ও সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির মধ্যে রাজনৈতিক সংলাপের প্রক্রিয়ায় ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির এক যুগ পূর্তি আজ। দেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করার পর তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য অঞ্চলের দীর্ঘ পুঞ্জিভূত সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহন করেন। গঠন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি। জাতীয় সংসদের তৎকালীন চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে এই জাতীয় কমিটিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে সফল বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেন। পার্বত্য অঞ্চলে অধিকার আদায়ের দাবী তুলে যারা সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেন সেই পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির নেতৃত্বের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি সংলাপ শুরু করে। উত্থাপিত দাবী দাওয়া নিয়ে ধারাবাহিক রাজনৈতিক সংলাপের প্রক্রিয়ায় সমঝোতায় উপনীত হয় জাতীয় কমিটি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। ইতি ঘটে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘকালের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির। দীর্ঘ কাঙ্খিত শান্তি পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই পার্বত্য চুক্তি পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষের মনে এনে দিয়েছে স্থিতি। প্রোথিত হয়েছে শান্তি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সারাদেশে শান্তিপ্রিয় প্রতিটি নাগরিককে শুধু আশ্বস্তই করেনি- বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রশংসাও কুড়িয়েছে। পৃথিবীময় এই চুক্তি শান্তির এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। এই চুক্তির আলোকে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল বিশেষ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। শক্তিশালী করা হয়েছে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ব্যবস্থাকে। চুক্তির আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে। ফলে পাহাড়ে শান্তির পথ সুগম হয়ে উঠছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে পাহাড়ে মানুষের জীবনাচরন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে বলেই পার্বত্য পরিস্থিতির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের যেসব পাহাড়ী মানুষ শরণার্থী হিসাবে পরদেশে আশ্রয় নিয়েছিলো, তারাও ফিরে এসেছেন নিজেদের আবাস ভূমিতে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ী শরনার্থীরা আস্থায় বুক ভরে ফিরে আসে পৈত্রিক ভিটে মাটিতে। প্রত্যাগত এই পাহাড়ী শরণার্থীদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ অনেকাংশেই সফল বাস্তবায়িত হয়েছে। অবাস্তবায়িত কাজও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন।

পার্বত্য শান্তি চুক্তি দীর্ঘ দিন ধরে বিরাজমান অশান্তির পরিস্থিতিকে চিরতরে দূর করে পাহাড়ে স্বস্তির পরিবেশ গড়ে তুলতে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে। অধিকার আদায়ের দাবী তুলে পাহাড়ী সংগঠনের যেসব নেতাকর্মী ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের পর সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলো, তাঁরাও ঐতিহাসিক পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের পর ফিরে এসেছেন স্বাভাবিক জীবনে। নিয়মতান্ত্রিক ধারায় পাহাড়ের দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সশস্ত্র কর্মীরা অস্ত্র জমা দানের মাধ্যমে পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করেছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির শর্তানুযায়ী ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী এবং অস্ত্র জমা দানকারী জন সংহতি সমিতির সদস্যদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের কাজ অধিকাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি মোতাবেক খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে জন সংহতি সমিতির সদস্যদের অস্ত্র জমাদান কর্মকান্ড অনুষ্ঠিত হয়।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধি প্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অস্ত্র জমা দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পরিহার করেন। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্তু লারমার হাতে তুলে দেন একগুচ্ছ ফুল। জননেত্রী শেখ হাসিনা সবুজ পাহাড়ের বিশাল আকাশে শান্তির পায়রা উড়িয়ে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেন পাহাড়ী পল্লী থেকে পল্লীতে- মানুষের ঘরে ঘরে। উৎসব মুখর পরিবেশে শান্তিকামী মানুষ প্রত্যক্ষ করেন শান্তির অগ্রযাত্রা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক সদিচ্ছায় পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির পথ প্রশস্ত হয়েছে বলেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ১৯৯৮ সালে ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই পুরস্কার আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাবমূর্তিকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে।

আজ সেই যুগান্তকারী দিন ২ ডিসেম্বর। ঐতিহাসিক পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের দিন। শান্তির সপক্ষে আজ এই দিনে আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করার শপথ নেয়ার দিন। সমস্ত দ্বিধা দ্বন্ব ভুলে শান্তির অভিযাত্রা পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাসহ সকল সম্ভাবনাকে আলোকিত করে তুলবে। মানুষে মানুষে শান্তির সপক্ষে বন্ধন দেশকে এগিয়ে নেবে সামনের দিকে- অনেক দূর। কাঙ্খিত শান্তি, উন্নয়ন, সম্প্রীতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির প্রত্যাশা বিস্তৃত হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের স্বাভাবিক জীবনে যেমন ছন্দ, আনন্দ ফিরিয়ে এনেছে, তেমনি অর্থনৈতিক কর্মধারায়ও গতি সঞ্চারিত করেছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে অত্যন্ত আন্তরিক, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ভারপ্রাপ্ত সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের এক যুগ পূর্তিতে আমি চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই।

স্মরণাতীকাল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানের ভিত্তিতে জীবনযাপন করে এসেছে। সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও মতের মানুষ পারস্পরিকভাবে অংশগ্রহণ করে সাম্প্রদায়িক ও নৃতাত্ত্বিক মিলনের অসংখ্য উদাহরণ স্থাপন করেছে। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের এই প্রবণতা লক্ষ্য করেই লিখেছিলেন যে, "এই এলাকা মহামানবের এক সাগর তীর"। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর পদচারণায় মুখরিত ছিল। পরবর্তীতে ইতিহাসের গতিধারায় সেখানে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ বসতি স্থাপন করে। নানা কারণে ঐ এলাকায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি অন্যান্য অঞ্চল থেকে তুলনামূলকভাবে কিছুটা পিছিয়ে থাকায় সরকার এ বিষয়ে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সরকার এলাকার নেতৃবৃন্দের সাথে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

দেশের এক বড় অংশের গুরুত্বপূর্ণ জনগণের জীবনে শান্তি, স্বস্তি, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই দিনটির তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। আমি এ উপলক্ষ্যে এলাকার জনগণকে অভিনন্দন জানাই এবং দিনটির সাফল্য কামনা করি।

মাসুদ আহমেদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির এক যুগ পূর্তি উপলক্ষে আমি পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীসহ সকল দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের বিরাজমান সংঘাত নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এই চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের জাতিগত হানাহানি বন্ধ হয়। অনগ্রসর ও অনুন্নত পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি ও উন্নয়নের ধারা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির জন্য ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার অর্জন এই চুক্তির আন্তর্জাতিক প্রশংসা ও স্বীকৃতির প্রতীক।

১৯৭৫ সালের পরবর্তী সরকারসমূহ পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি-শৃংখলা তথা সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সে অঞ্চলের বাঙালি-পাহাড়ী জনগোষ্ঠির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় খুন, রাহাজানি, অন্যের সম্পদ জবরদখল এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার এ অঞ্চলকে আরও অস্থিতিশীল করে তোলে।

এ অবস্থায় ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তি চুক্তি দেশের অখন্ডতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার একটি শক্তিশালী ও আন্তরিক প্রয়াস হিসেবে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়।

পরবর্তীতে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ঐতিহাসিক এই চুক্তির বিরোধিতা করে এ অঞ্চলকে পুনরায় অস্থিতিশীল ও অকার্যকর করতে চেয়েছিল। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী তথা বাংলাদেশের মানুষ তাদের সেই হীন উদ্দেশ্য সফল হতে দেয়নি।

বর্তমান সরকার পার্বত্য শান্তি চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কমিটিসমূহকে বিরাজমান সমস্যা দ্রুত সমাধানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

আমি এই চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সংসদ উপনেতা
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল অধিবাসীদের দেশের হিসেবে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত রেখে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া তরান্বিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ১ (এক) যুগ পূর্তিতে সমগ্র পার্বত্যবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এই বিশেষ অঞ্চলকে নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে তাদের নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াস পেয়েছে। তারা সেখানে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি, আলোচনার পরিবর্তে অস্ত্রের ঝনঝনানি আর সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে উসকিয়ে দিয়েছে বার বার। সামরিক-বেসামরিক মানুষের প্রাণহানি আর রাষ্ট্রীয় অর্থের ব্যাপক অপচয় যেন পার্বত্য অঞ্চলের জন্য নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এমনি এক সংঘাতময় পরিস্থিতিতে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে স্বাক্ষরিত এ চুক্তি পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে পাহাড়ী অঞ্চলে শান্তি বজায় ও উন্নয়নের জন্য চুক্তি বাস্তবায়ণ তরান্বিত করতে বদ্ধপরিকর। গত ৭ (সাত) বছরে বিএনপি-জামাত জোট ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে অনাগ্রহ ও নিষ্ক্রিয়তার কারণে যে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছিল তা কাটিয়ে উঠে ইতিমধ্যেই চুক্তির সফল পূর্ণ বাস্তবায়নে গতি ফিরে এসেছে।

নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বিশেষ ঐতিহ্যমন্ডিত এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নে যুগান্তকারী এই চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে আমি অত্র অঞ্চলে বসবাসরত সকল স্তরের জনগণসহ দেশবাসীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, এম.পি
সংসদ উপনেতা
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ও
আহবায়ক, শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি।

প্রতিমন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তির এক যুগ পূর্তিতে আমি এই চুক্তি সম্পাদনে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে সমগ্র পার্বত্যবাসী তথা দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।।

যুগান্তকারী এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরই ১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের মধ্য দিয়ে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান ভূমি সমস্যা সমাধানে ভূমি কমিশন এবং শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠনসহ জনসংহতি সমিতির সদস্য ও ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যাপক কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় না পাওয়ায় চুক্তির পূর্ণবাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

ঐতিহাসিক এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরই তৎকালীন বিরোধীদল বিএনপি এ চুক্তিকে সার্বভৌমত্ব ও সংবিধান পরিপন্থী কালোচুক্তি আখ্যায়িত করে তা বাতিলের দাবিতে মিছিল-সমাবেশ করে। এমনকি ২০০১ সালের বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহারে পরিস্কারভাবে ঘোষণা করা হয় যে, যদি ঐ নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার গঠন করে তাহলে চুক্তি বাতিল করবে। কিন্তু নির্বাচনে বিএনপি-জামাত জোট সরকার গঠন করলেও তাদের নির্বাচনী ওয়াদা মোতাবেক চুক্তি বাতিল না করে তা বাস্তবায়নের জন্য তৎকালীন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূইয়ার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। কার্যতঃ ঐ কমিটি তাদের মেয়াদকালে ১১ বার বৈঠক করে। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়নে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বরং চুক্তি বহাল রেখেই তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্থিতিশীলতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তি পূর্ব দ্বন্ব-সংঘাতময় পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তির তাদের এই হীন প্রচেষ্টাকে পাহাড়ের শান্তিপ্রিয় মানুষ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। উল্লেখ্য, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার একাধিকবার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের ঘোষণা দিলেও চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

২০০৮ সালের নির্বাচনের পূর্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে পার্বত্য চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ছিল। সে অনুযায়ী বর্তমান সরকার অত্যন্ত আন্তরিকভাবে চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নে কাজ করে চলেছে। বস্তুতঃ বিগত আওয়ামী লীগ সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া যেখানে রেখে গিয়েছিল ঠিক সেখান থেকেই বর্তমান সরকারকে শুরু করতে হয়েছে। এজন্য বিগত সাত বছরের স্থবিরতা কাটিয়ে নতুন উদ্যোগে সমস্ত প্রক্রিয়াকে সঞ্চালিত করা একটু সময় সাপেক্ষ।

বর্তমান সরকারের সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি, ভূমি কমিশন, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে। পুনর্গঠিত কমিটি/সংস্থাসমূহ চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব একনিষ্ঠভাবে পালন করে চলেছে এবং পার্বত্য চুক্তির স্বপক্ষে শক্তির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পার্বত্যবাসী ইতোমধ্যে এর সুফলও পেতে শুরু করেছে। আশা করা যায়, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শীঘ্রই পূর্ণতা পাবে।

বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সার্বিক উন্নয়ন যেমনঃ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, ধর্মীয় ও গ্রামীণ অবকাঠামো খাতে উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারকে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকরী করার জন্য সরকারী ২১টি দপ্তর/বিভাগকে ইতোমধ্যে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের অধীন ন্যস্ত করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট বিভাগসমূহ পরিষদের অধীনে ন্যস্ত করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তির সফল বাস্তবায়নের ধারা এ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চলমান সংঘাতময় অবস্থার অবসান ঘটিয়ে পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত অধিবাসীদের সকল ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের স্ব স্ব ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহনশীলতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে।

পার্বত্য শান্তি চুক্তির এক যুগ পূর্তিতে আমি এর পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

দীপংকর তালুকদার, এমপি

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়